BENGALI HONOURS

Semester- II

CC-3rd paper বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

Presented

by

Minal Ali Mia

Asst. Professor

Department of Bengali

Alipurduar Mahila Mahavidyalaya

Topic :` গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

'পথের পাঁচালী'র অমর স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আজ থেকে একশো দশ বছর আগে কাঁচড়াপাড়ার কাছে ঘোষপাড়া-মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে ২৮ ভাদ্র (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কথকতা করতেন। একজন সংস্কৃত পণ্ডিত হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে বিভূতিভূষণ ছিলেন সবার বড়। মা মৃণালিনী বড় কষ্ট করে স্বামী-সন্তানদের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দিতেন। মহানন্দ ছিলেন উদাসীন, বেড়াতেন, স্ত্রী মৃণালিনী দেবী সংসার-তরুণীকে একাই টেনে সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। 'পথের পাঁচালী'র হরিহর এবং সর্বজয়া চরিত্রে লেখকের মা-বাবার আদল সহজেই চেনা যায়। শৈশব থেকে অভাব অনটন আর দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হলেও বিভূতিভূষণ দারিদ্র্যকে কখনও অভিসম্পাত করেননি, বরং একে পরম সম্পদ বলে গণ্য করে বলেছেন : "Sadness ভিন্ন জীবনে Profundity আসে না। Sadness জীবনের একটা অমূল্য উপকরণ।"

এছাড়া বিভূতিভূষণ শৈশব থেকেই গ্রামবাংলার সবুজ, শ্যামল প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসে ছিলেন। তার সাহিত্যের অন্যতম উপাদান প্রকৃতি প্রেম। প্রকৃতি সম্বন্ধে তার একটা পূর্ণ আর সমগ্র অনুভূতি। ভালোমন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, আলো-অন্ধকার, রমণীয়তা-ভীষণতা সবকিছু নিয়ে আমাদের মহীয়সী পৃথিবী আর ধরিত্রী মাতার কোলে যে গাছপালা, বন-অরণ্য, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র আর বনবাসী মানুষ রয়েছে সে সমস্তের প্রতি তার মনে এক সদাজাগ্রত অনুভূতি আর আনন্দ, এক অপরূপ

প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি আর সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া পাঠক অনুভব করে। মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিমান হলেও তার ছোটগল্পে রয়েছে অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর। প্রায় দুশো পঁচিশটি গল্প তিনি লিখেছেন। এর সবই যে শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু অসার্থকতার মাপকাঠি দিয়ে কোনো শিল্পীকে সমগ্রভাবে বিচার করা সম্ভব, অনুচিতও বটে। বিভূতিভূষণ সার্থক রসোত্তীর্ণ গল্প অনেক রচনা করেছেন। তাদের সংখ্যা দেড়শোর চেয়ে কিছু বেশি বৈ কম হবে না।

২. বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র গ্রন্থের ভূমিকায় সমালোচক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গল্পকার বিভূতিভূষণ সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন : "বিভূতিভূষণের সমকক্ষ অথবা তার চেয়েও নিপুণতর গদ্যশিল্পী হয়তো বাংলা সাহিত্যে আরও দু-একজন ইতোমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন, কিন্তু তার পরিণত বয়সে রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের গল্পগুলোতে তিনি যে জাতীয় রসসমৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন ঠিক সেই শ্রেণীর রসসৃষ্টি আর কেউ কখনও করেছেন বলে আমার জানা নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে করতে পারবেন এমন আশাও পোষণ করি না।" অর্থাৎ গঠন পারিপাট্য, ঘটনা-বিন্যাস কৌশল রচনানৈপুণ্য বর্ণনার বর্ণাঢ্যতা প্রভৃতি বহিরঙ্গঘটিত উৎকর্ষ তার গল্পে যতখানি আছে অন্যান্য গল্পকারের রচনায়ও ততখানি আছে, তার চেয়ে বেশি থাকাও অসম্ভব নয়; কিন্তু জীবন-রূপসৃষ্টিতে এবং জীবন-রস

পরিবেশনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, অনন্য। Craftsmanহ হিসেবে, এমনকি বিশুদ্ধ artist হিসেবেও, তিনি যত বড় রসস্রষ্টা হিসেবের তার চেয়ে অনেক বেশি বড় রসের রাজ্রের অধিকর্তা হিসেবে তিনি অতুলনীয়, unique। এই জীবনরসিক বিভূতিভূষণকে পাওয়া যায় তার গল্পে। বিভূতিভূষণ মানুষকে ভালোবাসতেন। তার গ্রামের মানুষরা ছিলেন তার কাছে পরমাত্মীয়ের মতো। বিভূতিভূষণের দিনলিপির পতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে এই ভালোবাসার নিদর্শন-"অনেকদিন পরে গোপালনগরের হাটে গিয়েছি। সেই আশ্বিন মাসের পুজোর ছুটির পর আর আসিনি। সবাই ডাকে, সবাই বসতে বলে। মহেন্দ্র সেকরার দোকান থেকে আরম্ভ করে সবজির গোলা পর্যন্ত। হাটে কত ঘরামী ও চাষি জিজ্ঞেস করে করে এলেন বাবু? ওদের সকলকে যে কত ভালোবাসি, কত ভালোবাসি ওদের এই সরল আত্মীয়তাটুকু। ওদের মুখের মিষ্ট আলাপ।" (উর্মিমুখর, পৃ. ৩৯) "কাঁচিকাটা পুল পার হয়ে খানিকটা এসেই একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হলো। তার বয়স ষাট-বাষট্টি হবে, রঙটা বেজায় কালো, হাতে একটা পোটলা কাঁধে ছাতি। আমি বললুম-কোথায় যাবে হে? সে বললে, আজ্ঞে দাদাবাবু, ষাঁড়াপোতা ঠাকুরতলা যাব। বাড়ি শান্তিপুর গোঁসাইপাড়া। লোকটা বললে, একটা বিড়ি খান দাদাবাবু। বেশ লোকটা ওরকম লোক আমার ভালো লাগে। এমন সব কথা বলে যা সাধারণত শুনিনে।" এককম অজস্র বর্ণনা তার দিনলিপির পাতায় পাওয়া যাবে। কোনও কোনও সমালোচকের মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টি অতি রোমান্টিক, বাস্তবতাবিরোধী ও জীবনপলাতক। বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাসের মনস্বী পাঠকমাত্রেই

অবহিত আছেন এ অভিযোগের ভিত্তি কত দুর্বল। এই অপবাদের বিরুদ্ধে সমালোচক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে মত দিয়েছেন তাকে যুক্তিসঙ্গত এবং যথার্থ বলে যে কোনও নিরপেক্ষ পাঠক মেনে নিতে বাধ্য। তিনি বলেছেন, "বিভূতিভূষণের রচনায় আর যত কিছু দোষত্রুটিই থাক না কেন, কোথাও বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই।

৩

তার বক্তব্য এবং মানসিকতা দুইই অত্যন্ত সরল, ঋজু এবং সুস্পষ্ট। কাজেই সত্যিকার অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে তাকে বুঝতে না পারার কোনও যুক্তিযুক্ত হেতু নেই।" কেউ আবার বিভূতিভূষণের লেখায় সামন্ততান্ত্রিকতা খুঁজে পেয়েছেন। তাদের অভিযোগ বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ব্রাহ্মণ, তথা অভিজাত বর্ণহিন্দু। এ অভিযোগের সে সারবত্তা নেই, তা তার গল্প পড়লেই বোঝা যায়। বিভূতিভূষণের গল্পে অন্ত্যজশ্রেণী যেভাবে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে সমকালীন বাংলা গল্পে তার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। তার 'অসাধারণ' গল্পের বাগদী মেয়েটি, 'আমার ছাত্র' গল্পের গণেশ মুচি, 'বিপদ' গল্পের পতিতা হাজু থেকে শুরু করে অধিকাংশ গল্প জুড়েই রয়েছে দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রামবাংলার দুঃখী মানুষের যযাপিত জীবন। এরা গরিব, দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় না, অথচ হৃদয়-ঐশ্বর্যে এরা মহৎ, পরকে আপন করতে এদের জুড়ি নেই। বস্তুতপক্ষে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের বিরাট অংশ জুড়েই রয়েছে বাংলাদেশের গ্রাম্য জনপদ আর বাঙালি ঘরোয়া জীবনের চিত্র। এই গ্রাম্য, অনাদৃত, অস্পৃশ্য, অনভিজাত ব্রাত্যজনেরা কোনওরকম প্রসাধন ছাড়াই ধূলিমলিন পায়ে উঠে এসেছেন তার গল্প উপন্যাসে। তাই তারা এত জীবন্ত, অকৃত্রিম, আন্তরিক। এরকম অজস্র গল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় 'আহ্বান', 'ফকির', 'আমার ছাত্র', 'রূপ-বাঙাল', 'বারিক অপেরা পার্টি'র নাম।

৩. আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভূতিভূষণ তার গ্রামের লোকজনের সঙ্গে খুব আন্তরিকভাবে মিশতেন, তারাও কখনও তাকে পর মনে করেনি। এমনি একজন জমির করাতীর স্ত্রী। 'আহ্বান' গল্পে জমির করাতীর স্ত্রীর চেহারার বর্ণনা লেখক এভাবে দিয়েছেন; 'আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা ভারতচন্দ্র বর্ণিত জরতীবেশিনী অন্নপূর্ণার মতো, কোন তফাৎ নেই ডান হাতে নড়ি ঠুক ঠুক করতে করতে বোধ হয় বা বাজারের দিকে চলেছে। এ ধরনের বুড়িকে দেখে আমার বড় মায়া হয়Ñ নারী রূপের এক অপূর্ব পরিণতি।' এই জমির করাতীর বৌকে তিনি অমর করে রেখেছেন 'আহ্বান' গল্পে।
বিভূতিভূষণের গল্প সংগ্রহের মধ্যে তো বটেই, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে 'আহ্বান' এর মতো গল্প খুব বেশি লেখা হয়নি। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক অপরূপ ভাষ্য এ গল্প। সহজ-সরল আখ্যানভাগ সংবলিত এ গল্পের অসাধারণত্ব এর অন্তর্নিহিত মানবিক রস। বিভূতিভূষণের অনেক গল্পের মতো এ গল্পেরও বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। দুঃখী, অসহায়, বৃদ্ধা যার তিনকূলে কেউ নেই এক নাতনী ছাড়া। তাও নাতজামাই বুড়িকে খেতে পরতে দেয় না। বুড়ি কোনরকমে দিন আনে দিন খায় করে চালায়। তবু এককালে সে সম্পন্ন

গৃহস্তের স্ত্রী ছিলÑএ কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না বলে গল্প লেখকের জন্যই প্রায়ই সে হাতে করে এটা ওটা নিয়ে আসে। এই স্নেহের দান গ্রহণ করতে প্রায়ই কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন লেখক। কারণ গ্রামে নানারকম লোকজন-উপরন্তু লেখক ব্রাহ্মণবংশীয় সন্তান, বুড়ি মুসলমান, মাঝে মাঝে কঠোর ব্যবহার করে লেখকের মন অনুতাপে ভওরে উঠেছে। ‘বুড়ি কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাখল না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতেই সে এসে জুটবে। অ গোপাল, এই দুটো কচি শসার জালি মোর গাছের- এই ন্যাও। নুন দিয়ে খাও দিনি মোর সামেন।’ বৃদ্ধার স্নেহের সম্বোধনে মাতৃস্নেহ শতধারে উৎসারিত। বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়লে লেখক তাকে দেখতে গেলে বুড়ি আবদার করে বলেছিল: গোপাল, যদি মরি, আমার কাফনের কাপড় তুই কিন দিস।

৪. ‘রূপো-বাঙাল’ গল্পেও পাই এমনি এক চরিত্র যে আপনার জীবন দিয়ে রক্ষা করেছে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি। “আমার ছাত্র” গল্পের গণেশ মুচিও বিভূতিভূষণের স্বগ্রামের এক বাস্তব চরিত্র। দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ গণেশকে বর্ণনা করেছেন, নিরীহ, সাধু, সরল প্রকৃতির মানুষ বলে। মূর্খ গণেশ মুচিকে শিক্ষিত করে তোলার পুরো দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ।

এই কঠিন কর্ম সম্ভব হয়েছিল গণেশেরই ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নিষ্ঠার কারণে। লেখকের চেষ্টায় সীমিত কয়েকটি ইংরেজি শব্দ লিখে গণেশ দাদা মহামুখী। সরল, সাধারণ চাষী গণেশ মুচির সঙ্গে বহুদিন পর লেখকের দেখা হলে লেখক দেখেন গণেশ বৃদ্ধ হয়ে গেছে, সামান্য কুঁজোও। তবু তার শিক্ষাগ্রহণের স্পৃহা এতটুকুও কমেনি। গল্পটি শেষ করেছেন বিভূতিভূষণ এভাবে “কি বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে। কি ইংরেজি শিক্ষার দিক থেকে গণেশ দাদা সারাজীবন প্রথম সোপানেই রয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল যার সাহায্যে ও সব সোপান অতিক্রম করে। আমাদের অনেককে অতিক্রম করে অনেক উঁচুতে পৌঁছেছিল।” মানুষের ভিতরকার অবিনাশী, শাশ্বত গুণাবলীর সন্ধান করেছেন বিভূতিভূষণ।

৫. মহৎ মানুষ হতে হলে মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হয় তার জন্যে কোন কৃত্রিম সাধনা বা শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন- “বিভূতিভূষণের লেখায়, কথায়-বুঝিয়ে বলা যায় না এমন একটা জিনিস আছে যা আমাদের মনের গভীরে গিয়ে পৌঁছায়, আমাদের জাগিয়ে তোলে, আর আমাদের মনের অবচেতনায় তোলে, আর

আমাদের মনের অবচেতনায় আদিম যুগ থেকে যে প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যের একটা অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা আছে। সেইটে জিইয়ে তোলে। বিভূতিভূষণ নিজেও বিশ্বাস করতেন মানুষের ব্যথাহত আত্মার আকুতি-সেটাই আসল জিনিস। তিনি বিশ্বাস করতেন it is the prayer, the music, the song fo the human soul, ïay teller of tales হওয়া তাঁর কাছে মুখ্য ছিল না। মানুষের প্রাণের কথা ফুটিয়ে তুলতে হবে ব্যঞ্জনা দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে।"

৫

তাই তো, তাঁর গল্পে শাশ্বত মানুষের মেলা-যে মানুষ মঙ্গলকামী, কল্যাণকামী যাবতীয় শুভ চিন্তার ধারক, উপাসক। শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসেও বিভূতিভূষণ বাংলার হারিয়ে যাওয়া সমস্ত মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে ওঠেন। তাঁর দেখা গ্রামবাংলার দুঃখ-দুর্দশা-দারিদ্র্য-হাহাকার কিছুই অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। 'পথের পাঁচালী'র অপু-দুর্গার মতো শত শিশু এখনও-গুড়কেই সবচেয়ে মিষ্টি বলে জানে। বলা যায়, বিভূতিভূষণ এখনও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। শাশ্বত বাঙালির হারানো মূল্যবোধ ফিরে পাবার জন্যেই আমাদের বার বার তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।